# সহিষ্ণু সময়

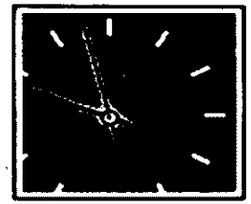

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

## প্রশ্নপত্র ফাঁস ও তদন্ত

মাছেভাতে বাঙালীর জানা কথা যে মাছের পচন শুরু হয় মাথায়। তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে সারা অঙ্গে।

সমাজদেহকে যদি মীনরূপে কল্পনা করা যায়, সেখানেও একই ব্যাপার। অর্থাৎ পচনটা শুরু হয় সমাজের-রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে। তারপর সেটা ছড়ায় সকল স্তরে।

মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, আমাদের একপেশে নৈতিকতা বোধ নিচের স্তরের পচন নিয়ে যতটা ভাবিত, উপরিস্তরের পচন বিষয়ে ততটাই উদাসীন।

দেশের পাবলিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের টোকাটুকি নিয়ে আমরা সবাই নিন্দামুখর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে এক রকম জেহাদ-ই ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় অবৈধ টোকাটুকির কারণে প্রতিদিন শত শত ছাত্র বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাই এ সময়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত বড়ো খবর। আমরা কার্যটাকেই বড়ো করে দেখছি। কারণটাকে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় না পৌঁছলে যে এ ধরনের গণটোকাটুকি সম্ভব নয়, সে কথাটা যতটা গুরুত্বের সঙ্গে আসা উচিত, তা আসছে না। বিভিন্ন স্তরে কর্তব্যচ্যুতির কথাটা আসছে। কিন্তু কর্তব্যচ্যুতির কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। ট্র্যাফিক পুলিশ যে কারণে ঘুষ খায়, ঘুষ না খেলে তাকে উপোস করতে হবে। ঠিক একই কারণে স্কুলের শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করেন। কেউ কেউ উপরি আয়ের জন্য করেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেটের দায়ে করেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিসিএস পরীক্ষায় এবার প্রথম দিনেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, পরীক্ষার্থী যাঁরা এই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাননি, অনেকে গুজব মনে করে পাওয়ার চেষ্টা করেননি তাঁরা পরে ঘটনার সত্যতা বুঝতে পেরে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন। শুরুতে পিএসসির কর্তাব্যক্তিরা, খোদ পিএসসির চেয়ারম্যান, ব্যাপারটা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ এতই মজবুত ছিল যে শেষমেশ সরকারকেই হস্তক্ষেপ করতে হ'ল। কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রাথমিক অস্বীকৃতি গিলে খেতে হ'ল। পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সচরাচর এর কার্যকলাপে সরকার হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু দরকার বোধ করলে সরকার করে। ইতিপূর্বে করেছে। এতে পিএসসির মর্যাদাহানি হয়েছে, তবে যাদের নিয়ে ও যেভাবে পিএসসি গঠিত হচ্ছে, তাদের মর্যাদাবোধ অতটা সূক্ষ্ম থাকার কথা নয়। সরকারের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের কারণে হয়তো গুঞ্জন উঠেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেউ এজন্য পদত্যাগ করেছেন, এমন কথা শোনা যায়নি। ধারণা হিসাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন উচ্চতম নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলবে। পিএসসির চেয়ারম্যান, সদস্য, সবাইকে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এসব পদে নিয়োগের শর্ত যদি হয় ব্যক্তিটিকে সরকারের আস্থাভাজন হতে হবে- সাদা কথায় সরকার পছন্দ হতে হবে- তাহলে ওই শপথের কার্যকরতা থাকে না।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, এ মর্মে খবর হওয়া মাত্র যেটা প্রত্যাশিত ছিল, পিএসসির তরফ থেকে বলা হবে, আমরা এ বিষয়ে তদন্ত করব। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কিন্তু বাস্তবে কি হ'ল? খোদ চেয়ারম্যান অভিযোগ অস্বীকার করলেন। যেন কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নামে দোষারোপ করেছে!

যখন সরকার থেকে ঘোষণা হ'ল, পরীক্ষা বাতিল, তখনও তিনি তদন্তের কথা বললেন না। বেশ দেরিতে যখন বললেন, তাতে পরিষ্কার হ'ল, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি এটা করলেন। তদন্ত কমিটিও যেভাবে গঠিত হয়েছে, তাতে অপরাধী ধরা পড়বে আশা করা যায় না। এ কমিটি নিজেদের অর্থাৎ পিএসসির দোষ ঢাকতেই ব্যস্ত থাকবে। তদন্তের ফল কী দাঁড়ায়, তা থেকেই বোঝা যাবে, আমাদের সন্দেহ যথার্থ কিনা।

> *সবচেয়ে হতাশাজনক হচ্ছে এই যে, তদন্ত ব্যাপারটাই এক ধরনের অভিনয় : মানুষকে বোঝানোর প্রয়াস যে আমরা প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বের করব ও আমজনতাকে জানাবো। এ পর্যন্ত অসংখ্য তদন্ত হয়েছে, বিচার বিভাগীয় তদন্তও হয়েছে। তারপর কী হয়েছে আমরা জানি না। তদন্তের রিপোর্ট আমরা কেউ দেখিনি। তাহলে তদন্ত কেন? কার জন্য? আমাদের জাতীয় সংসদ কি এমন একটা আইন পাস করতে পারে না,' যাতে সরকারী উদ্যোগে, বিশেষত একজন বিচারপতির সভাপতিত্বে, কোন তদন্ত কমিশন/কমিটি হলে, সে তদন্ত সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা ও তদন্তের রিপোর্ট একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা। আইনত বাধ্যতামূলক হবে, এ না হলে, শুধু লোক দেখানোর জন্য তদন্তের অভিনয় ও পাবলিক মানির অপব্যয়- গ্রহণযোগ্য হবে না*

প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ঘটনা নিয়ে কথাবার্তার মধ্যে কয়েকটি কোচিং সেন্টারের সম্ভাব্য যোগসাজশের কথা উঠেছে। এমন কথাও শুনতে পাচ্ছি যে, এই কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে কতিপয় ছাত্রনেতা। এ যদি সত্য হয়, তাহলে পুরো তদন্তের ব্যাপারটা বেশ 'নাজুক' হয়ে পড়বে। তদন্তের অভিনয় হবে, তদন্ত হবে না। অভিনয় হোক, তবু তদন্ত হোক। অভিনয়ে আমাদের আপত্তি সাজে না। আমরা সত্য আর অভিনয়ের মধ্যে আর তফাত করি না, যেহেতু আমাদের রাজনীতি, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা, সকল ক্ষেত্রেই অভিনয় একটা বাস্তবতা। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ি- সেটা অভিনয়, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি- সেটা অভিনয়। আমরা গরিবের দুঃখে কাঁদি- সেটা অভিনয়। আমরা রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহারে কৃচ্ছ্র পালন করি- সেটা অভিনয়। আমরা ঋণখেলাপীদের শাস্তির কথা বলি- সেটা অভিনয়। আমরা গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার কথা বলি- সেটাও অভিনয়। এই অভিনয়ের মধ্যে যে গভীর প্রতারণা রয়েছে, সেটাই মর্মান্তিক সত্য।

সবচেয়ে হতাশাজনক হচ্ছে এই যে, তদন্ত ব্যাপারটাই এক ধরনের অভিনয় : মানুষকে বোঝানোর প্রয়াস যে আমরা প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বের করব ও আমজনতাকে জানাবো। এ পর্যন্ত অসংখ্য তদন্ত হয়েছে, বিচার বিভাগীয় তদন্তও হয়েছে। তারপর কী হয়েছে আমরা জানি না। তদন্তের রিপোর্ট আমরা কেউ দেখিনি। তাহলে তদন্ত কেন? কার জন্য? আমাদের জাতীয় সংসদ কি এমন একটা আইন পাস করতে পারে না, যাতে সরকারী উদ্যোগে, বিশেষত একজন বিচারপতির সভাপতিত্বে, কোন তদন্ত কমিশন/কমিটি হলে, সে তদন্ত সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা ও তদন্তের রিপোর্ট একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা। আইনত বাধ্যতামূলক হবে, এ না হলে, শুধু লোক দেখানোর জন্য তদন্তের অভিনয় ও পাবলিক মানির অপব্যয়- গ্রহণযোগ্য হবে না।

শুধু সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের সকলের গর্বের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবত শতাধিক তদন্ত হয়েছে। এর একটিরও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ আছে। এ অভিযোগের কোন উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিয়েছে বলে শুনিনি।

যেমন বিচার বিভাগকে, তেমনই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে, সরকারী হস্তক্ষেপের বাইরে রাখা উচিত। এ বিষয়ে দ্বিমত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এমনও দেখা গেছে, পিএসসি প্রশাসনের কোন একটি শাখায়, শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করল, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ, নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন ও সরকারের কাছে প্রেরণ-সবই করল, কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যে একটি সরকার বিদায় নিয়েছে, অন্য এক সরকার এসেছে, নতুন সরকার এসে সব ভণ্ডুল করে দিল। এর ফলে এক সঙ্গে দুটো অন্যায় করা হ'ল। এক. প্রার্থীদের প্রতি অন্যায়, দুই. পিএসসির প্রতি অন্যায়। দুটিই গুরুতর অন্যায়। এ ধরনের অন্যায় কাজের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। এর পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মর্যাদা কি থাকে?

অবশ্য এ নিয়ে অযথা আক্ষেপ করে লাভ নেই। যে বিকলাঙ্গ গণতন্ত্র নিয়ে আমরা গণতন্ত্রের অভিনয় করে চলেছি, সেখানে মর্যাদার কোন ঠাঁই নেই। এই বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রে একজন রাষ্ট্রপতি সমূহ অমর্যাদা মাথায় নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর হাইকোর্টের বিচারপতিই বলুন, বা প্রধান নির্বাচন কমিশনারই বলুন, একজনকে তাঁর প্রাপ্য আসন না দিলে, অন্যজনকে বিতাড়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের মতো গর্হিত চিন্তা করলে, মর্যাদার কথাটা কি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না?

সিইসির মর্যাদা, তথা নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা নিয়ে বিগত দিনগুলিতে যে টানা-হ্যাঁচড়া চলছে, তার পরিণতি কি হবে, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সিইসি ঘোরতর অন্যায় করেছেন, তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন, যা সরকারের স্পর্শকাতর জায়গায় লেগেছে। তিনি, তাঁরই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। তিনি যেভাবে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, যেভাবে সহিংসতা ও বল প্রয়োগ বন্ধে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন, তা পাননি বলে প্রকাশ্যে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। অনেকে বলতে পারে, এ অবস্থায় তাঁর উচিত ছিল পদত্যাগ করা; তা তিনি করেননি। কেবল তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সবচেয়ে অন্যায়- সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে- তিনি করেছেন, সফরকারী ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে তাঁর হতাশার কথা বলে। কাজটি যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, তা কি তিনি বোঝেননি। এরপর তিনি তাঁর মর্যাদা নিয়ে স্বস্থানে টিকে থাকবেন, অবশ্যদৃষ্টে তা মনে হয় না। বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রে মর্যাদার মতো ঠুনকো জিনিস হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে, নির্বাচন কমিশন থাকবে, থাকবে না কেবল এই বিজাতীয় ধারণা- মর্যাদা।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 2005